॥ ভূমিকা ॥

দুখানি প্রহসন ছাড়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বড় কবি মধুসূদন দত্তের সাহিত্য রচিত হয়েছিল প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পুরাণ অথবা ইতিহাস অবলম্বনে। অবশ্য সকলেই জানেন, প্রাচীন বিষয় নিয়ে লেখা হলেও এসব সৃষ্টি নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত। মধুসূদনের সাহিত্যের যাঁরাই আলোচনা করেছেন তাঁরাই এই নতুন তাৎপর্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই করেছেন কিন্তু তাতে রামায়ণ মহাভারত পুরাণের থেকে সংগৃহীত উপকরণ উপাদানের উল্লেখ থাকলেও তাদের যথোচিত বিশ্লেষণ ও বিচার হয়েছে, তা বলতে কুণ্ঠা বোধ করি। সেই লক্ষ্য নিয়েই বর্তমান নিবন্ধের সূচনা।

এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য মধুসূদনের সাহিত্যের আধুনিকতা বা ইয়োরোপীয় ভাব-প্রেরণাকে অস্বীকার করা নয়, বরং পৌরাণিক চরিত্র যে নতুন প্রেরণায় নতুন প্রাণ লাভ করেছে, তারই শিল্পী হিসাবে মধুসূদনের মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। রেনেসাঁস কথাটির মৌলিক অর্থ প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কারের দ্বারা নবজীবনের সঞ্চার; প্রাচীন মূল্যবোধের যথাযথ পুনর্বর্তন কিন্তু রেনেসাঁসের ধর্ম নয়। প্রাচীন সাহিত্যে মানবজীবনের যে উদার মুক্ত বিকাশ ছিল, নানা বিধিনিষেধে তত্ত্ব মতে যা পরে হয়েছিল রুদ্ধ, তাকে মুক্তি দিয়েই নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি, নতুন মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা। সেই জন্য মধুসূদনের সাহিত্যে যেসব প্রাচীন প্রসঙ্গ আছে, তার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ না হলে আধুনিক তাৎপর্যটি বোঝা যাবে না। মধুসূদনের রাম-চরিত্রকে বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের রামচরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেই জানতে হবে।

মধুসূদন সংস্কৃত পড়েছিলেন টোল-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের মত নয়, নতুন দৃষ্টিতে নতুন প্রেরণায়। সেকথা তিনি চিঠিতে নানাভাবেই বলে গিয়েছেন। মধুসূদন যে সংস্কৃত উত্তমরূপেই শিখেছিলেন — এ বিষয়ে হয়তো সকলে অবহিত নন। 'জীবন চরিত'-কার যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে "সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কখনই বিশেষ অনুরাগ বা অধিকার ছিল না।" কিন্তু চিঠিপত্রে নিজের সাহিত্যরুচি ও ভাষাশিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মধুসূদন বারে বারে সংস্কৃত ভাষার উল্লেখ করেছেন, মূল ব্যাস বাল্মীকির রচনা এবং

কালিদাসের কাব্য পড়ার কথা বলেছেন। বিশপ্স্ কলেজের শিক্ষাবিধিতে সংস্কৃত শিক্ষা-পদ্ধতির কথা যা জানা যায়, তাতেও তাঁর সে-শিক্ষা ভালই হয়েছিল মনে হয়।

মধুসূদনের সংস্কৃতচর্চা সম্বন্ধে স্বভাবতঃই আমাকে অনুসন্ধান করতে হয়েছে। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ তথ্য খুব বেশি পাওয়া না গেলেও সেকালের দিনে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা কি ছিল সে-সম্বন্ধেও ধারণা না থাকলে মধুসূদনের সংস্কৃতচর্চার ব্যাপকতা কতখানি হতে পারে বোঝা যায় না। তাতে মধুসূদনের প্রতিভার এই দিকটাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে পরিবেশের অনুকূলতা না পেলেও অন্তরের স্বাভাবিক প্রেরণায় এ ভাষাকে তিনি অধিগত করতে পেরেছিলেন। প্রথম অধ্যায়ে মধুসূদনের সময়ের সংস্কৃতশিক্ষা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার যৌক্তিকতা এখানেই।

মধুসূদনের রচনাগুলি বিচার করলে দেখা যাবে প্রায় সব বিষয়বস্তু নিয়েছেন দেশীয় প্রাচীন সাহিত্য থেকে। প্রাচীন সাহিত্য বলতে রামায়ণ, মহাভারত, সংস্কৃত পুরাণ এবং ক্লাসিকেল সংস্কৃত সাহিত্য – প্রধানতঃ কালিদাস। সংস্কৃত মহাকাব্যের সঙ্গে বাংলা কাশীরাম কৃত্তিবাসও আছেন – এঁরা তাঁর আবাল্য সঙ্গী। মাদ্রাজ-বাসের সময় তিনি যখন ইংরেজিতে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখে অর্থ উপার্জন করে চলেছেন তখনও এই দুখানি কাব্য পড়ছেন – সে কেবল ভাষা মনে রাখার জন্য তা নয়। মনে রাখতে হবে সে সময়ে তিনি তামিল তেলেগু ভাষাও শিখেছিলেন; রাবণচরিত্র কল্পনায় তার কিছু প্রভাবও পড়েছে। ইংরেজিতে লেখা তাঁর প্রথম কাব্য Captive Lady – তেই সংস্কৃত পুরাণের কিছু অনুপ্রবেশ আছে, কবি নিজেই গৌরদাসকে চিঠিতে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। কলকাতায় ফিরে এসে যখন বাংলায় লিখতে আরম্ভ করলেন, তখন প্রতিটি নাটক-কাব্যের মূল কাহিনীই যে কেবল পুরাণ থেকে নিলেন তা নয়, তাকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য যে শিল্পরীতি অবলম্বন করলেন, তাতে দেশীয় আদর্শের অনুসরণ এবং নানা পৌরাণিক কাহিনী ও কল্পনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম থেকে তাঁর সমস্ত রচনা সম্পর্কেই একথা সত্য। ইতিহাস-নির্ভর কৃষ্ণকুমারী নাটক বা মায়াকাননের মত নিছক কল্পনাভিত্তিক রচনা সম্পর্কেও কথাটি অপ্রযোজ্য নয়।

যোগীন্দ্রনাথ বসু মধুসূদনের রচনা ও জীবনকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের কাল – এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু এরকম বিভাজন যুক্তিযুক্ত মনে করি

না । তাঁর মাত্র তের বৎসরব্যাপী সাহিত্যজীবনে কবিমানসের একটি সম্পূর্ণ রূপই পাই । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব মিলিয়েই এই রূপ । পাশ্চাত্য প্রভাবকে বাদ দিয়ে মধুসূদন সম্পর্কে আলোচনা সম্ভব নয় । এই নিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাশ্চাত্য প্রভাবের আলোচনা করা হয়েছে সম্পূর্ণতার খাতিরে । তাঁর কবিমানসকে বোঝবার জন্য যেটুকু অপরিহার্য এই অধ্যায়ে সেটুকু আলোচনা করে নিবন্ধের অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন রচনায় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে ।

এখানে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন 'পুরাণ' শব্দটিকে আমি বিশিষ্ট অর্থে গ্রহণ করিনি । কেবল অষ্টাদশ পুরাণ উপপুরাণ না বুঝিয়ে মহাকাব্য (সংস্কৃত এবং বাংলা), পুরাণ, সংস্কৃত সাহিত্য, এমনকি প্রাচীন বাংলা কাব্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছি । কালিদাস বলেছিলেন —

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্ । — মালবিকাগ্নিমিত্রম্

এখানে 'পুরাণ' অর্থ যে-কোন প্রাচীন সাহিত্য । আমিও এই অর্থেই মধুসূদনের কাব্যকে পুরাণের আলোকে বিচার করেছি ।

ইতিপূর্বে মধুসূদনে সংস্কৃত প্রভাবের আলোচনা অবশ্য কিছু কিছু হয়েছে । যেমন জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মেঘনাদবধের এবং দীননাথ সান্যাল মেঘনাদবধ বীরাঙ্গনা ও চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সম্পাদনা-সূত্রে মধুসূদনের কাব্যাংশগুলির সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের কাব্যাংশগুলির মিল দেখিয়েছেন । ইদানীন্তন কালে অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মধুসূদনের কবিমানস ও কাব্যালঙ্কার সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য লক্ষণের উল্লেখ করেছেন । তবে তাঁর প্রধান লক্ষ্য রচনাশৈলী । অবশ্য 'মেঘনাদবধ কাব্য-জিজ্ঞাসা'য় তাঁর আলোচনার ক্ষেত্র প্রশস্ততর । আমার আলোচনায় মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্যই এসেছে ।

এই আলোচনায় অর্থনির্ণয়ে সুনিশ্চিত হতে গিয়ে মূল সংস্কৃতের সঙ্গে অনুবাদকে সর্বদাই মিলিয়ে নিতে হয়েছে ।

রামায়ণের অনুবাদের জন্য হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য ও রাজশেখর বসু উভয়ের অনুবাদই ব্যবহার করেছি । রাজশেখর বসুর অনুবাদ 'সংক্ষিপ্ত' বলে প্রয়োজনবোধে হেমচন্দ্রকে গ্রহণ করেছি ।

করেছি, তবে যেখানে রাজশেখরের অনুবাদেই কাজ চলে যায় মনে হয়েছে, সেখানে তাঁর লেখা থেকেই উদ্ধার করেছি। রাজশেখরের গ্রন্থের পঞ্চম মুদ্রণ (১৩৬১) এবং হেমচন্দ্রের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ (১৯৭৫) ব্যবহার করেছি — পৃষ্ঠাঙ্ক এই সংস্করণের, প্রতিক্ষেত্রে সেটা উল্লেখ করিনি।

মহাভারতেরও রাজশেখর বসুর অনুবাদ (প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৬) কয়েকক্ষেত্রে, ব্যবহার ও যেখানে তাতে কাজ না চলে সেখানে কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ গ্রহণ করেছি। অনুবাদ যেখানে রাজশেখরের সেখানে তা পৃষ্ঠাঙ্কসহ উল্লেখ করেছি আর লেখকের নাম না করে কেবল উদ্ধৃতিচিহ্ন দিয়ে যেখানে অনুবাদ ব্যবহার করেছি — সেগুলি কালীপ্রসন্নের অনুবাদ।

পুরাণের ক্ষেত্রে আমার অবলম্বন পঞ্চানন তর্করত্নের সম্পাদিত মূলগ্রন্থ এবং অনুবাদ। অনুবাদের যেখানে উদ্ধৃতিচিহ্ন দেওয়া আছে সেখানে তাঁর অনুবাদই বুঝতে হবে। তাঁর সম্পাদিত পুরাণ যেখানে পাওয়া সম্ভব হয় নি সেখানে বিভিন্নজনের সম্পাদিত মূল এবং অনুবাদ ব্যবহার করতে হয়েছে, তাই সামান্য পাঠভেদ থাকা অসম্ভব নয়; পঞ্চানন তর্করত্ন ছাড়া অন্যের অনুবাদে উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করিনি। কোথাও বা নিজে অনুবাদ করে নিতে হয়েছে। বিশেষ মূল্যবান্ মনে হলে সংস্কৃত মূল উদ্ধার করেছি, অন্যত্র কেবল অনুবাদই ব্যবহার করেছি।

বাল্মীকি-রামায়ণের সংস্কৃত উদ্ধৃতি 'অর্থশাস্ত্র' পত্রিকাতে প্রকাশিত মূল এবং কখনও কল্যাণ-বোম্বাই-এর লক্ষ্মীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস থেকে গঙ্গাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণদাসের মুদ্রিত ও প্রকাশিত মূল কাব্য থেকে গৃহীত। বাস্তব কারণেই সবসময় একই বই ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ কিছু কিছু আছে। কিন্তু আমার বিষয়টির প্রকৃতি এমন যে এর জন্য সেগুলি সর্বদা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় নি। মহাভারতের ক্ষেত্রে অনুবাদ দ্বারাই কাজ চলেছে। মূল ব্যাসকৃত মহাভারতের উদ্ধৃতি ব্যবহার করার তেমন দরকার হয় নি কারণ তার আক্ষরিক অনুসরণ মধুসূদনে তেমন দেখা যায় না। যেখানে ভাবানুসরণ লক্ষ্য করা যায় সেখানেই মূল সংস্কৃত উদ্ধৃতি অপরিহার্য।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রসঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ ব্যবহার করেছি এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা সর্বত্রই ঐ গ্রন্থের, তাই প্রতিবার সংস্করণ উল্লেখ করবার

প্রয়োজন বোধ করি নি। কাশীরামদাসের মহাভারতের জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্তৃক সংশোধিত শ্রীরামপুর সংস্করণ (১৮৩৬)-এর কেবলমাত্র দ্বিতীয় 'খণ্ড' দেখতে পেয়েছি, প্রথম খণ্ডটি কোথাও পাই নি। বিরাট পর্বের থেকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধৃতিগুলির পাঠ এই সংস্করণের এবং যথাস্থানে তার উল্লেখ করেছি। অন্য অংশের জন্য দেব সাহিত্য কুটীর থেকে প্রকাশিত এবং সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত (১৩৮০) কাশীদাসী মহাভারতের উপরে নির্ভর করতে হয়েছে। উদ্ধৃতিতে যেখানে কেবলমাত্র পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ করা আছে, সেখানে এই গ্রন্থের পাঠই ধরে নিতে হবে। এখন প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে মধুসূদন ব্যাসের মূল সংস্কৃত মহাভারত থেকে উপকরণ ততখানি নেননি যতখানি নিয়েছিলেন কাশীরামের মহাভারত থেকে। তুলনায় বাল্মীকির প্রভাব কৃত্তিবাসের চেয়ে মধুসূদনের উপর বেশি।

যোগীন্দ্রনাথ বসুর লেখা মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত-এর উল্লেখ বহুবারই করতে হয়েছে, সংক্ষেপে শুধু জীবনচরিত বলেই গ্রন্থটির নির্দেশ করেছি এবং পৃষ্ঠাঙ্ক সর্বদাই ঐ গ্রন্থের শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৩৭৮) সংস্করণের, তাই প্রতিবার সংস্করণ উল্লেখ করিনি।

মধুসূদনের রচনার জন্য অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত সাহিত্য সংসদ সংস্করণের (১৩৭৪) উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছি। মেঘনাদবধ কাব্য ও তিলোত্তমাসম্ভবের উদ্ধৃতিতে পংক্তি-সংখ্যা নির্দেশ করেছি ব্যবহারের সুবিধার জন্য। তবে বীরাঙ্গনা বা অন্য পদ্যপংক্তির সংখ্যা নির্দেশ করা তেমন দরকার মনে করিনি। পত্রসংখ্যাও এই গ্রন্থাবলীতে নির্দেশিত সংখ্যাই বুঝতে হবে।

রবীন্দ্র রচনাবলীর পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত শতবর্ষ সংস্করণ ব্যবহার করেছি, সর্বদা সেটা উল্লেখ করিনি।

আলোচনায় অনেক সময়তেই গ্রীক পুরাণের দেবতা ও মানুষের নামের উল্লেখ পাওয়া যাবে। যথাযথভাবে সে উচ্চারণ কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে মতভেদ আছে এবং বাংলায় বানান সমস্যাও দেখা দেয়। ইলিয়াডের বঙ্গানুবাদে দীপক ভট্টাচার্যকে অনুসরণ করেছি; তিনি নামগুলি যেভাবে বানান করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করার সময়ে সেই বানানই গ্রহণ করেছি।

মধুসূদন সম্পর্কিত বেশ কয়েকখানি সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে ইতিপূর্বে । নগেন্দ্রনাথ সোম এবং যোগীন্দ্রনাথ বসুও জীবনী-রচনার সঙ্গে সাহিত্য সমালোচনা করেছেন । প্রয়োজন মত সেসব নানা বই ব্যবহার করেছি ; তবু মধুসূদনের রচনাকে বুঝবার জন্য সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি তাঁর নিজের লেখা চিঠিগুলি থেকে । এই চিঠিগুলিতে সমালোচনার মূলসূত্র , তাঁর নিজের সাহিত্যাদর্শ শিল্পভাবনা ও আত্মপ্রবণতা ধরা পড়েছে । তাই পদে পদেই এই চিঠিপত্র থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে হয়েছে । বস্তুতঃ মধুসূদনের সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য সমালোচক মধুসূদন নিজেই , আমরা তাঁকে অনুসরণ করেছি মাত্র ।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গনে বসে এ কাজ করেছি, সেখানকার গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ পাওয়াতে বিশেষ সুবিধা হয়েছে । অধিকাংশ পুরাণ ও তার অনুবাদ ঐ গ্রন্থাগারেই পেয়েছি । তাছাড়া শিলিগুড়ি সাহিত্য পরিষদে এবং শিলিগুড়ি কলেজের গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় বই কিছু পেয়েছি । বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারেও কিছু কিছু বই দেখতে পাওয়ায় বিশেষ উপকৃত হয়েছি । কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে গিয়ে বই দেখার সুযোগও হয়েছে । পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বিশ্বাস নানাভাবে সহায়তা করেছেন ; তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । শ্রীরামপুরের কেরি লাইব্রেরিতে কাশীরাম দাসের মহাভারতের শ্রীরামপুর সংস্করণ (১৮৩৬) দ্বিতীয় খণ্ডটি দেখার সুযোগ হয়েছে ।

শ্রীযুক্ত মৃন্ময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থের কাছে মহাভারত সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানতে পেরে বিশেষ উপকৃত হয়েছি — তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি । উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রণব ভট্টাচার্য আমাকে কোন কোন তথ্য জানতে সাহায্য করেছেন । তাঁকেও কৃতজ্ঞতা জানাই ।

গার্গী দত্ত

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮২

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়